সংবাদ

তারিখ 25 MAR 2009
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

দেশের কথা দশের কথা

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে যত সমস্যা

এম আর খায়রুল উমাম

সম্প্রতি এক গবেষণায় মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী বাড়ছে– সংবাদে আমার মতো অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মুসলমানদের ইতিহাস দেখলে উদ্বিগ্ন হওয়ারই কথা। সময়ের কাজ ঠিক সময়ে করার সিদ্ধান্ত এ উপমহাদেশে মুসলমানরা নিয়েছে এমন উদাহরণ পাওয়া কষ্টকর। ব্রিটিশ আমল থেকে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা শিক্ষা সম্পর্কে প্রচণ্ড উদাসীন ছিল। ইংরেজি শিক্ষাকে অবহেলা করেছে। সে কারণে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ হলেও ইসলামিয়া কলেজ হতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এর আগে মাদ্রাসা নিয়ে এদেশের মুসলমানরা সন্তুষ্ট ছিল। যেন দেশ স্বাধীন হলে কি হবে তাই বলে ঐতিহ্য রক্ষা করব না, তা হতে পারে না! বাঙালি মুসলমান এখনও ঐতিহ্য ধরে রেখে এগিয়ে চলেছে। যাদের ইবনে সিনা আছে, আল-বেরুনী আছে, ইবনে বতুতা আছে, তাদের স্মৃতিচারণে কোন সমস্যা নেই। এই বীরদের নিয়ে আমাদের খারাপ চলছে না। কষ্ট করে নিজেদের যুগোপযোগী হতে হবে কেন? সরকারও ঐতিহ্য রক্ষার বাইরে নেই। মোট শিক্ষা বাজেটের ২২ শতাংশ মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় করে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য, ২০০২-০৩ অর্থবছরে যেখানে ব্যয় করা হয়েছে জনপ্রতি ৪৫৫১ টাকা সেখানে সরকারি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করে ৫০৮৪ টাকা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মাদ্রাসা শিক্ষায় তালেবান বানানোর প্রজেক্টে সরকারি অর্থায়নে জোর দেয়া হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভেতরে দিনে দিনে বেকার হয়ে পড়ছে সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী হতে দোষের কোথায়? বরং সময়ের পশ্চাৎপদতা আমাদের পেছন থেকে টেনে রাখবে এটাই স্বাভাবিক। এতে শাসক শ্রেণীর লাভ, শোষক শ্রেণীরও লাভ। চক্ষুষ্মান মানুষ থাকবে না, তাদের কাছে জবাবদিহিতা থাকবে না। পরকালের সুখ ইহকাল উৎসর্গে নিবেদিত থাকার কারণে নিজেদের প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখা যাবে। এমন সুযোগ পাওয়া গেলে কে আর বিপরীত স্রোতে হাঁটতে চায়?

১৯০৬ সালের আদম শুমারিতে দেখা যায়, বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থদের শিক্ষিতের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬৩.৯, ৬৪.৮ এবং ৫৬। অপরদিকে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৬.৮ ভাগ। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০.৬৪ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও ৮২.২ ভাগ চাকরির সুবিধা ভোগ করত। অপরদিকে সারা বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫১ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও তারা মাত্র ১০.৩ ভাগ চাকরির সুবিধা পায়। যুগের সঙ্গে চলতে না পারার ইতিহাস আমাদের আছে। আজ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধিতে আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি। রাষ্ট্র যদি প্রগতিশীল হয়, জনবান্ধব হয় তবে জনগণের মঙ্গলের পথে পরিচালনার একটা দায়িত্ব নিতে হয়। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। স্বাধীনতার ৩৮ বছরে সর্বজনস্বীকৃত কোন শিক্ষানীতিই গ্রহণ করা সম্ভব হলো না। এখানে বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবসম্মত অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে আশা করা যাবে? বরং ঐতিহ্য রক্ষার শিক্ষা হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হবে এটাই তো স্বাভাবিক।

সরকার সমর্থক সপ্তাহের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স (ইসলামী শিক্ষা/আরবি সাহিত্য) সমমানের ঘোষণা দেয়। আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিলকে ডিগ্রি এবং কামিলকে মাস্টার্স সমমানের করার আশ্বাস দিয়েছিল। সরকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কওমি মাদ্রাসা সনদকে স্বীকৃতি প্রদান করে। কোন একাডেমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ন্যূনতম প্রয়োজন অনুভব করেনি। ধর্মীয় আরবি শিক্ষাকে ভিত্তি করে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন আমলের এই শিক্ষা ব্যবস্থার ৯০ শতাংশই আরবি বাকি ১০ শতাংশ অন্যান্য বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে। মূলধারার শিক্ষা পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সমমানের ঘোষণায় সরকার দেশের শিক্ষক সমাজ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা বা মতবিনিময়ের কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি। এই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জাগতিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও এখানে বিবেচ্য হয়নি। একটা ডিগ্রিকে সমমানের মূল্য দিতে যে পাঠ্যবই, পাঠ্যক্রম ও পরিচালনা পদ্ধতির আধুনিকায়ন প্রয়োজন তাও কেউ মনে করেনি।

সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রীতির নিদর্শন আর কি হতে পারে? শিক্ষার মানে অনেক বেশি পশ্চাৎপদ ও অকার্যকর হওয়া সত্ত্বেও শুধু রাজনৈতিক কারণে মাস্টার্সের সমমান দেয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিতে সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কেন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হলো তা বিবেচনার দাবি রাখে। এই মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রীতি দেশ ও জাতির জন্য কি উপকারে আসবে? সংস্কার, পরিমার্জন করেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমতা আনার ব্যবস্থা করা দরকার। স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে কোন প্রকার সংযোজন-সংশোধন ছাড়া তা কাম্য হতে পারে না। তার ওপর শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সুফল বয়ে আনতে পারে না। এখানে আলোচনার ভিত্তিতে একাডেমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যিক। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন আনা বন্ধ হওয়া দেশ ও জাতির স্বার্থে জরুরি।

একটি জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি জানার জন্য সে জাতির প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে ধারণা করা যায়। আমাদের লক্ষ্যহীন বহুধাবিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে সামনে অন্ধকার ভিন্ন কোন কিছুই দেখা যায় না। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও সর্বজনসম্মত, গ্রহণযোগ্য, আধুনিক প্রগতিশীল কোন শিক্ষানীতি সরকারগুলো রাখতে পারেনি। অথচ প্রতিটি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই শিক্ষানীতি প্রণয়নে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে এবং সে মতো কার্যক্রম রেখে থাকে। তারপরও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে এখনও আমাদের কোন শিক্ষানীতি নেই। এই পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি জাতীয় শিক্ষা কমিশন পেয়েছি। অনেক অর্থ ব্যয়ের পর এসব কমিশন বহু সুপারিশ উপস্থাপন করেছে; কিন্তু তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়নি। বরং এসব সুপারিশ যখন প্রকাশিত হয়েছে তখনই শিক্ষানুরাগীরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। কারণ বর্তমানের ঘুণে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এসব সুপারিশের সংযোজন ঘটলে বাকি সর্বনাশ ত্বরান্বিত করবে। ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনটি পাশে সরিয়ে রাখলে দেখা যায় অন্য সব প্রতিবেদনে পরস্পরবিরোধী দায়সারা গোছের সুপারিশ প্রদান করেছে।

২০০২ সালে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার শিক্ষা কমিশন তাদের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে দেখেছেন– 'শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা জোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে সহায়তা করে।' আমাদের শিক্ষা কমিশনগুলোর এমন সুপারিশের কারণেই সর্বজনসম্মত গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি জনগণের পাওয়া সম্ভব হয়নি। জাতির এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নিজেদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধার প্রয়োগ প্রয়োজন ছিল। তা কেন অজানা কারণে সাহসের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব হলো না ভাবা প্রয়োজন। প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা একা নন এই দলে। ১৯৮৭ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মফিজউল্লিন আহমেদের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো 'সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বাস ও শ্রষ্টার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও কর্ম প্রেরণার উৎস হিসেবে সৃষ্টিকর্তার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার ওপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।'

মহাজ্ঞানী-মহাজনদের পথ ধরে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা হাঁটবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। ১৯৭৪ সালে যেখানে সব ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এক হাজার ৪১২টি সেখানে ২০০৩ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ১৪টিতে। যা প্রতি বছর গড়ে বেড়েছে প্রায় ২৯ শতাংশ। তবে সম্প্রতি সময়ের বৃদ্ধিটা চোখে পড়ার মতো। ১৯৯৯ সালে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৬৯টি। এই চার বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার প্রায় ১৯ শতাংশ। এ থেকে প্রমাণিত হয় মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজে অক্সিজেন পাওয়া করে নিচ্ছে। সরকার গত কয়েক বছর বিপুল ব্যয় করে এই মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন করতে চাইলেও উল্লেখযোগ্য কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অবস্থার উন্নতি তো দূরে থাক ক্রমশ অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, শ্রেণীগত বৈষম্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এক সংঘাত-হানাহানির পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির প্রাথমিক শিক্ষা ন্যূনতম চালু করা প্রয়োজন। শিশুদের অভিন্ন চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী হতে, হীনমন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধে, দাম্ভিকতা ও অহংবোধ সৃষ্টি না করতে, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে প্রগতি ও উন্নয়নমুখী করতে গণতান্ত্রিক সমাজ, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় সমৃদ্ধ হতে অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মের বিষয়ে প্রচণ্ড স্পর্শকাতর হওয়ার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারকে কঠিন করে রেখেছে। আমাদের আলেম সমাজ নবীজী (সা.) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রথম মাদ্রাসা 'দারুল আরকাম' অণুকরণে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য ধরণ করে থাকতে চায়। কোন অবস্থায় এর বাইরে আসতে চায় না। এখানেই সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। সাধারণ সেক্যুলার শিক্ষাকে যেমন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ধারা হিসেবে শক্তিশালী করা জরুরি তেমনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার যে হচ্ছে সেটা বন্ধ করাও জরুরি।